أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book#.67) www.motaher21.net

أَحْسَنَ الْقَصَص

সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী (১২)

THE BEST STORY (12)

ذٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ

অদৃশ্য জগতের খবর থেকে এটা তোমাকে ওয়াহী করে জানালাম। ষড়যন্ত্র করার সময় যখন তারা তাদের কাজে জোটবদ্ধ হয়েছিল তখন তুমি তো তাদের কাছে ছিলে না।

১০২ নং আয়াতের তাফসীর:

ذٰلِكَ অর্থাৎ ইউসুফ (عليه السلام) এর জীবনের এসব ঘটনাসহ যা কিছু উল্লেখ করা হল সব গায়েবের বিষয়। নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগ থেকে হাজার বছরের আগের কথা। এসব জানা নিরক্ষর নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষে কক্ষনো সম্ভব নয়, তা তাছাড়া তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না অর্থাৎ নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগ ও ইউসুফ (عليه السلام) এর যুগ এক নয়। তাঁকে জানানো হয়েছে ওয়াহীর মাধ্যমে। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয়, নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েব জানেন না। তিনি যদি গায়েব জানতেন তাহলে তা ওয়াহীর মাধ্যমে জানানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। এ সম্পর্কে সূরা আলি ইমরানের ৭ ও ৪৪ নং আয়াত, সূরা কাসাসের ৪৫-৪৬ নং আয়াত এবং সূরা সাদের ৬৯-৭০ নং আয়াতে

আলোচনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ ইউসুফ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকালে, যখন তারা তাকে কূপে নিক্ষেপ করে এসেছিল। অথবা উদ্দেশ্য ইয়াকূব (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকালে, যাতে তারা তাকে এই বলেছিল যে, ইউসুফ (আঃ)-কে নেকড়ে বাঘে খেয়ে নিয়েছে এবং এই হল রক্তরঞ্জিত তার জামা। এই বলে তার সাথে ছলনা করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ এ স্থানেও এ বিষয়ের খন্ডন করেছেন যে, নবী কারীম (সাঃ) গায়বের এলেম (অদৃশ্যের জ্ঞান) রাখতেন। তবে এখানে খন্ডন সাধারণ জ্ঞানের নয়, কেননা মহান আল্লাহ তাঁকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। এ খন্ডন প্রত্যক্ষ দর্শনের, যেহেতু সেই সময়ে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। অনুরূপ এমন লোকদের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল না, যাদের কাছ থেকে তিনি তা শুনতে পারেন। এ তো শুধু আল্লাহই, যিনি তাঁকে এই অদৃশ্য ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন, যা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তিনি আল্লাহর সত্য নবী এবং তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হয়। মহান আল্লাহ আরো কয়েক স্থানে অনুরূপ অদৃশ্যের জ্ঞানের এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা খন্ডন করেছেন। (উদাহরণ স্বরূপ দেখুনঃ সূরা আলে ইমরান ৩:৭ ও ৩:৪৪ নং আয়াত, সূরা ক্বস্বাস্ব ২৮:৪৫-৪৬নং আয়াত এবং সূরা স্বা-দ ৩৮:৬৯-৭০ নং আয়াত)

বলা হয়েছে, এগুলো গায়েবের সংবাদ, যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি। এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে-ইমরানের ৪৩তম আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। সূরা হূদের ৪৯ তম আয়াতে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ঘটনা প্রসঙ্গেও তাই বলা হয়েছে। এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবীগণকে গায়েবের সংবাদ বলে দেন। বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম নবী মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এসব গায়েবের সংবাদের বিশেষ অংশ দান করা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী নবীগণের তুলনায় বেশী। এ কারণে তিনি উম্মতকে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। 'কিতাবুল-ফিতান' শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সম্বলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীসের গ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে। এ সমস্ত গায়েবের জ্ঞান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে দান করেছেন।

ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনী পুরোপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এই কাহিনী ঐসব গায়েবী সংবাদের অন্যতম, যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্য কলা-কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল। এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ ঠিক ঠিক বলে দেয়া আপনার নবুওয়াত, রিসালাত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। [ইবন কাসীর] কেননা, কাহিনীটি হাজারো বছর পূর্বেকার। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না যে, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন এবং আপনি কারো কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেননি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা কারো কাছে শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

সুরা: ইউসুফ

আয়াত নং :-১০৩

وَ مَآ اَكۡثَرُ النَّاسِ وَ لَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِيۡنَ

কিন্তু তুমি যতই চাওনা কেন অধিকাংশ লোক তা মানবে না।

১০৩ নং আয়াতের তাফসীর:

(وَمَآ أَكْثَرُ النَّاسِ) অর্থাৎ পূর্ববর্তী জাতির বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ, কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্কীকরণ এবং উপস্থিত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনবে না। সুতরাং অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনুক তা একজন নাবীর আশা করে লাভ নেই। কারণ পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা জানেন অধিকাংশ মানুষ ঈমান বর্জন করবে, শয়তানের দলে শামিল হবে। তবে মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান জানানো অব্যাহত রাখতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ)

"আর আমার কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা কম" (সূরা সাবা ৩৪:১৩)

(وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر)

অর্থাৎ হে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! তোমার কাজের বিনিময়ে যদি কোন পারিশ্রমিক চাইতে তাহলে তারা সন্দেহ করত যে, হয়তো সম্পদের লোভে সে নতুন পথের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে। এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে এ জন্য যে, মানুষ এ থেকে হিদায়াত গ্রহণ করবে, সঠিক পথ চিনবে ও উপকৃত হবে। কিন্তু যাদের স্বচ্ছ অন্তর নেই তারা হিদায়াত নিতে পারবে না।

অর্থাৎ এরা এক অদ্ভূত ধরনের হটকারিতার রোগে ভুগছে। তোমার নবুওয়াতের বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য অনেক চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করে তারা যে দাবী করেছিল তুমি সঙ্গে সঙ্গেই সবার সামনে তা পূরণ করে দিয়েছো। এখন হয়তো তুমি আশা করছো, এ কুরআন তুমি নিজে রচনা কর না বরং সত্যিই তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়, একথা মেনে নিতে তারা আর ইতস্তত করবে না। কিন্তু নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, এরা এখনো মানবে না এবং নিজেদের অস্বীকৃতির ওপর অবিচল থাকার জন্য আরেকটি বাহানা খুঁজে বের করবে। কেননা, এদের না মানার আসল কারণ এটা নয় যে, তোমার সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হবার

জন্য এরা কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ চাচ্ছিল এবং তা এরা এখনো পায়নি। বরং এর কারণ শুধুমাত্র একটিই যে, এরা তোমার কথা মেনে নিতে রাজী নয়। তাই এরা আসলেই মেনে নেবার জন্য কোন প্রমাণ খুঁজে ফিরছে না বরং না মানার জন্য বাহানা খুঁজে বেড়াচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন ভুল ধারণা দূর করা এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়। যদিও বাহ্যত তাঁকেই সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে দলকে সম্বোধন করে তাদের সমাবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তাদেরকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অলংকারপূর্ণ বাগধারার মাধ্যমে এ হটকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করা। তারা নিজেদের মাহফিলে তাঁকে ডেকে এনেছিল পরীক্ষা করার জন্য। সেখানে তারা অকস্মাৎ দাবী করেছিল, যদি আপনি নবী হয়ে থাকেন তাহলে বলুন বনী ইসরাঈলের মিসর যাবার ঘটনাটা কি ছিল? এর জবাবে তাদেরকে তখনই এবং সেখানেই এ সংক্ষিপ্ত কাহিনী শুনিয়ে দেয়া হয়। আর সর্বশেষে এ ছোট্ট বাক্যটি বলে তাদের সামনে একটি আয়নাও তুলে ধরা হয়েছে যে ওহে হঠকারীর দল! এ আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখে নাও, তোমরা কোন মুখে পরীক্ষা নিতে বসে গিয়েছিলে? বিবেকবান ব্যক্তি তো সত্য প্রমাণ হয়ে গেলে তা মেনে নেয়, এজন্যই সে পরীক্ষা নিয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা নিজেদের মনের মতো প্রমাণ পেয়ে গেলেও তা মেনে নাও না।

অর্থাৎ আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী এ ঘটনাগুলো এজন্যই জানিয়েছেন যাতে এর দ্বারা মানুষের জন্য শিক্ষণীয় উপকরণ থাকে এবং মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার নাজাতের মাধ্যম হয়। তারপরও অনেক মানুষই ঈমান আনে না। এ জন্যই আল্লাহ্ বলেন যে, আপনার ঐকান্তিক ইচ্ছা যতই থাকুক না কেন অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর যদি আপনি যমীনের অধিকাংশ লোকের কথামত চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে" [সূরা আল-আন'আমঃ ১১৬] [ইবন কাসীর]

সুতরাং অধিকাংশ মানুষ ঈমান না আনলে আপনার কিছু করার নেই। আপনি চাইলেই কাউকে হিদায়াত দিতে পারবেন না। [কুরতুবী]

সুরা: ইউসুফ

আয়াত নং :-১০৪

وَ مَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ

অথচ তুমি এ খেদমতের বিনিময়ে তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিকও চাচ্ছো না। এটা তো দুনিয়াবাসীদের জন্য সাধারণভাবে একটি নসীহত ছাড়া আর কিছুই নয়।

১০৪ নং আয়াতের তাফসীর:

যাতে তাদের সংশয় সৃষ্টি হয় যে, নবুঅতের দাবি তো শুধু ধন সঞ্চয় করার বাহানা।

যেন মানুষ এর দ্বারা হিদায়াত গ্রহণ করে এবং নিজ ইহ-পরকাল সাজিয়ে নেয়। এখন বিশ্ববাসী যদি এ থেকে বিমুখ হয় এবং হিদায়াত গ্রহণ না করে, তাহলে ত্রুটি তাদের এবং সেটা তাদের দুর্ভাগ্য। কুরআন তো বাস্তবে বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত ও নসীহতই নিয়ে এসেছে। (পারস্য কবি বলেন,) 'চামচিকা যদি দিনের বেলায় না দেখে, তাহলে সূর্যের দোষ কি?'

ওপরের সতর্কীকরণের পর এটি দ্বিতীয় সতর্কীকরণ। তবে ওর তুলনায় এর মধ্যে তিরস্কারের দিকটি কম এবং উপদেশের অংশ বেশী। এ উক্তিটিও বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে করা হয়েছে কিন্তু আসলে এখানে কাফেরদের সমাবেশকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে একথা বুঝানোই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর বান্দারা! একটু ভেবে দেখো, তোমাদের এ হঠকারিতার এখানে অবকাশ কোথায়? যদি পয়গম্বর নিজের কোন ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য দাওয়াত ও প্রচারের এ কাজ চালু করে থাকতেন অথবা নিজের জন্য তিনি কিছু চাইতেন তাহলে অবশ্যি তোমাদের জন্য একথা বলার সুযোগ ছিল যে, আমরা এ ধরনের মতলবী লোকের কথা কেন মানবো? কিন্তু তোমরা দেখছো, এ ব্যক্তি নিস্বার্থ, তোমাদের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের ভালোর জন্য নসীহত করে যাচ্ছেন এবং এর মধ্যে তার নিজের কোন স্বার্থ লুকিয়ে নেই। কাজেই এ ধরনের হঠকারিতার সাহায্যে এর মোকাবিলা করার পেছনে কি যুক্তি আছে? যে ব্যক্তি সবার ভালোর জন্য নিস্বার্থভাবে একটি কথা বলে, তার বিরুদ্ধে খামাখা জিদ ধরে বসে থাকা কেন? খোলা মনে তার কথা শোনো। ভালো লাগলে মেনে নাও, ভালো না লাগলে মানবে না।

সুরা: ইউসুফ

আয়াত নং :-১০৫

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ

আকাশসমুহে ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো তারা অতিক্রম করে যায় কিন্তু সেদিকে একটুও দৃষ্টিপাত করে না।

১০৫ নং আয়াতের তাফসীর:

(وَكَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ)

অর্থাৎ আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্বের ওপর প্রমাণ বহন করে এমন কত নিদর্শন রয়েছে, মানুষ সকাল-সন্ধ্যা তা প্রত্যক্ষ করে কিন্তু তা অনুধাবন করে না এবং অনুধাবন করার চেষ্টাও করে না। মানুষ প্রতিদিন দেখছে সূর্য পূর্ব দিকে উঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। কিন্তু কোনদিন চিন্তা করল না, এ সূর্য কে উদিত করছে, কে অস্ত করাচ্ছে? তিনি কত জন, কত শক্তির মালিক? ইত্যাদি নিয়ে একটু চিন্তা করলে আল্লাহকে চিনতে পারা যাবে এবং নিজের ভেতর থেকেই তাঁর কাছে আত্মসর্ম্পণ চলে আসবে।

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং উভয়ের মধ্যে অসংখ্য বস্তুর অস্তিত এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, একজন সৃষ্টিকর্তা ও স্রষ্টা আছেন, যিনি উক্ত বস্তুসমূহকে অস্তিত দান করেছেন এবং একজন পরিচালক আছেন, যিনি এসব এমনভাবে পরিচালনা করছেন যে, আদিকাল থেকে এই নিয়ম-শৃঙ্খলা সুচারুরূপে চালু আছে; অথচ এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সংঘর্ষ নেই। কিন্তু মানুষ এসব কিছু দেখার পরও এমনিই উপেক্ষা ও অতিক্রম করে চলে যায়, না তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, আর না এ সবের মাধ্যমে নিজ প্রতিপালককে চেনে।

ওপরের এগারটি রুকূ'তে হযরত ইউসুফের (আ) কাহিনী শেষ হয়েছে। যদি নিছক গল্প বলা আল্লাহর অহীর উদ্দেশ্য হতো তাহলে ভাষণ এখানেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু এখানে তো কোন উদ্দেশ্য সামনে রেখেই গল্প বলা হয়। এ উদ্দেশ্য প্রচার করার যে কোন সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করতে মোটেই ইতস্তত করা হয় না। এখন যেহেতু লোকেরা নিজেরাই নবীকে ডেকে এনেছিল এবং গল্প শোনার জন্য কান খাড়া করেছিল, তাই তাদের ফরমায়েশী কথা শেষ হতেই নিজের উদ্দেশ্যমূলক কয়েকটি বাক্যও বলে দেয়া হলো। অতি সংক্ষেপে এ কয়েকটি বাক্যে উপদেশ ও দাওয়াতের সমস্ত বিষয়বস্তু একত্র করে দেয়া হয়েছে।

লোকদেরকে তাদের গাফলতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি জিনিস নিছক একটি জিনিসই নয় বরং সত্যের প্রতি ইঙ্গিতকারী একটি নিদর্শনও। যারা এ জিনিসগুলোকে শুধুমাত্র একটি জিনিস হিসেবে দেখে তারা মানুষের মতো নয় বরং পশুর মতো দেখে। পানিকে পানি, গাছকে গাছ এবং পাহাড়কে পাহাড় তো পশুরাও দেখে থাকে এবং নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেকটি পশু এগুলোর ব্যবহার ক্ষেত্রও জানে। কিন্তু মানুষকে যে উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি সহকারে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য মস্তিষ্ক দান করা হয়েছে তা শুধু এজন্য নয় যে, মানুষ সেগুলো দেখবে এবং সেগুলোর ব্যবহার ক্ষেত্র জানবে বরং মানুষ সত্য অনুসন্ধান করবে এবং এ নিদর্শনগুলোর সাহায্যে তাকে চিনে নেবে, এটিই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ গাফলতির মধ্যে পড়ে আছে। আর এ গাফলতিই তাদেরকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ

করেছে। যদি মনের দুয়ারে এ তালা না লাগিয়ে নেয়া হতো, তাহলে নবীদের কথা বুঝা এবং তাঁদের নেতৃত্ব থেকে ফায়দা হাসিল করা লোকদের জন্য এত কঠিন হতো না।

সুরা: ইউসুফ

আয়াত নং :-১০৬

وَ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَ هُمْ مُّشْرِكُوْنَ

তাদের বেশীর ভাগ আল্লাহকে মানে কিন্তু তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে।

১০৬ নং আয়াতের তাফসীর:

এখানে এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর সাথে অন্য বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছেঃ

(وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ)

অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করে, তারাও শির্কের সাথে করে। তারা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে রব, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা স্বীকার করে, কিন্তু তা সত্বেও তারা ইবাদাত করার সময় আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্যদেরও ইবাদাত করে। [তাবারী; কুরতুবী; বাগভী; ইবন কাসীর; সাদী] তাদের ঈমান হল আল্লাহ্‌র প্রভূত্বের উপর, আর তাদের শির্ক হল আল্লাহ্‌র ইবাদাতে। এ আয়াতের মধ্যে ঐ সমস্ত নামধারী মুসলিমও অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহ্‌র ইবাদাতের পাশাপাশি পীর, কবর ইত্যাদির ইবাদাতও করে থাকে।

ইবনে কাসীর বলেনঃ যেসব মুসলিম ঈমান সত্বেও বিভিন্ন প্রকার শির্কে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি তোমাদের জন্য যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শির্ক। সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেনঃ

রিয়া (লোক দেখানো ইবাদাত) হচ্ছে ছোট শির্ক। [মুসনাদে আহমাদ ৫/৪২৯] এমনিভাবে অন্য এক হাদীসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কসম করাকেও শির্ক বলা হয়েছে। [সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ১০/১৯৯, হাদীস নং ৪৩৫৮] আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মান্নত করা এবং যবেহ্ করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে আরও এসেছে, 'মুশরিকরা তাদের হজের তালবিয়া পাঠের সময় বলত: 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা, ইল্লা শারীকান হুয়া লাকা তামলিকুহূ ওমা মালাক। (অর্থাৎ আমি হাযির আল্লাহ্ আমি হাযির, আমি হাযির, আপনার কোন শরীক নেই, তবে এমন এক শরীক আছে যার আপনি মালিক, সে আপনার মালিক নয়) এটা বলত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ শির্কী তালবিয়া পড়ার সময় যখন তারা ('লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা) পর্যন্ত বলত, তখন তিনি বলতেন যথেষ্ট এতটুকুই বল। [মুসলিম: ১১৮৫] কারণ এর পরের অংশটুকু শির্ক। তারা ঈমানের সাথে শির্ক মিশ্রিত করে ফেলেছে। [ইবন কাসীর]

ওপরে যে গাফলতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এটা আসলে তার স্বাভাবিক ফল। লোকেরা যখন পথের চিহ্ন থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে তখনই তারা সোজা পথ থেকে সরে গেছে এবং চারপাশের ঝোপঝাড়ের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। এরপরও খুব কম লোকই এমন রয়েছে, যারা গন্তব্য সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে এবং আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা হিসেবে চূড়ান্তভাবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। অধিকাংশ লোক যে গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে তা আল্লাহকে অস্বীকার করার গোমরাহী নয় বরং শিরকের গোমরাহী। অর্থাৎ তারা আল্লাহ নেই একথা বলে না বরং তারা আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও অধিকারে অন্যদেরকে কোন না কোনভাবে অংশীদার করার বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। পৃথিবী ও আকাশের বিভিন্ন নিদর্শন, যেগুলো সর্বত্র সর্বক্ষণ আল্লাহর একক সার্বভৌম কর্তৃত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, সেগুলোতে যদি শিক্ষণীয় দৃষ্টিতে দেখা হতো তাহলে কোনদিন এ বিভ্রান্তির জন্ম হতো না।

(وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ)

অর্থাৎ বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন মা'বূদের ইবাদত করে। যেমন মক্কার মুশরিকরা বিশ্বাস করত তাদের হায়াত-মউত, আকাশ-জমিন, বৃষ্টি দান এমনকি বিপদ থেকে উদ্ধারের মালিক একমাত্র আল্লাহ, কিন্তু ইবাদত করত লাত, উযযা, মানাতসহ শত শত প্রতিমার। যার কারণে তারা তাওহীদে রুবুবিয়্যাহর প্রতি (তথা সকল কিছুর মালিক ও স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা) বিশ্বাস থাকলেও আখিরাতে নাজাত পাবে না, কারণ ইবাদত করেছে আল্লাহ ছাড়া অন্যের। এভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বিভিন্ন মূর্তি, প্রতিমা, বৃক্ষ, নক্ষত্র, কবর, মাযার ও তাগুত ইত্যাদির ইবাদত করার মাধ্যমে

মুশরিক হয়ে যাচ্ছে অথচ আবার মুসলিম দাবি করে। এভাবে একজন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না এবং হলেও মুসলিম থাকবে না। প্রকৃত মুসলিম হতে হলে অবশ্যই তাওহীদ ও শির্ক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতঃ সর্বদা আকীদাহ ও আমলে তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ)

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই; আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্র"তা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আন।" (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

সুতরাং ঈমান হল সকল ভ্রান্ত মা'বূদ, তাগুত ও তাদের অনুসারীদেরকে বর্জন করা এবং এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অটল থাকা।

সুরা: ইউসুফ

আয়াত নং :-১০৭

اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

তারা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহর আযাবের কোন আকস্মিক আক্রমণ তাদেরকে গ্রাস করে নেবে না অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের ওপর সহসা কিয়ামত এসে যাবে না?

১০৭ নং আয়াতের তাফসীর:

লোকদেরকে সতর্ক করাই এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অবকাশ জীবনকে দীর্ঘতর মনে করে এবং বর্তমানের শান্তি ও নিরাপত্তাকে চিরস্থায়ী ভেবে পরিণামের চিন্তাকে ভবিষ্যতের জন্য শিকেয় তুলে রেখো না। কোন ব্যক্তিই নিশ্চয়তা সহকারে একথা বলতে পারে না যে, তার জীবনকাল অমুক সময় পর্যন্ত অবশ্যি স্থায়ী হবে। কাকে

হঠাৎ কখন গ্রেফতার করা হবে এবং কোথা থেকে কি অবস্থায় তাকে ধরে আনা হবে তা কেউ জানে না। তোমাদের দিন-রাতের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ভবিষ্যতের গর্ভে তোমাদের জন্য কি লুকানো আছে তা এক মুহূর্ত আগেও তোমরা জানতে পার না। কাজেই যা কিছু চিন্তা করার এখনই করে নাও। জীবনের যে পথে এগিয়ে যাচ্ছো তার ওপর সামনে অগ্রসর হবার আগে ঠিক পথে যাচ্ছো কিনা একটু থেমে চিন্তা করে দেখো। এটা যে সঠিক পথ, এর সপক্ষে কোন যথার্থ দলীল তোমাদের কাছে আছে কি? বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনাবলী থেকে এর সত্য-সঠিক পথ হবার কোন প্রমাণ পাচ্ছো কি? তোমাদের স্বজাতীয় লোকেরা এ পথে চলে ইতিপূর্বে যে ফল লাভ করেছে এবং বর্তমানে তোমাদের সমাজ সংস্কৃতিতে এর যে ফলাফল দেখা যাচ্ছে তা কি একথাই প্রমাণ করে যে, তোমরা সঠিক পথে যাচ্ছো?

এ আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করত এবং পারিপার্শ্বিক শহর ও স্থানসমূহের ইতিহাস পাঠ করত, তবে নিশ্চয়ই জানতে পারত যে, নবীগণের বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। কওমে-লূতের জনপদসমূহকে উল্টে দেয়া হয়েছে। কওমে-'আদ ও কওমে সামূদকে নানাবিধ আযাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেয়া হয়েছে। দুনিয়াতে তাদের উপর এ ধরনের আযাব আসার ব্যাপারে তারা কিভাবে নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবছে? আর আখেরাত তা তো তাদের কাছে হঠাৎ করেই আসবে। যখন তারা সেটার আগমন সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না। ইবন আব্বাস বলেন, যখন আখেরাতের সে চিৎকার আসবে তখন তারা বাজারে ও তাদের কর্মস্থলে কাজ-কারবারে ব্যস্ত থাকবে। [বাগভী]

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সংখ্যা গরিষ্ঠতা সত্যের মাপকাঠি নয়, বরং সত্যের মাপকাঠি হল হক, যদিও তার পক্ষে একজন থাকে।

২. রব (প্রতিপালক) হিসেবে যেমন আল্লাহ তা'আলাকে মানা হয় মা'বূদ (একমাত্র ইবাদতের যোগ্য) হিসেবেও অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলাকে মানতে হবে। অন্যথায় নাজাত পাওয়া যাবে না।

৩. যারা অবিশ্বাসী বা কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক এ অবস্থায় মৃত্যবরণ করে তারা আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে কখনও রক্ষা পাবে না।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰي بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

বল, 'এটাই আমার পথ, আল্লাহর পথে আহবান জানাচ্ছি, আমি ও আমার অনুসারীরা, স্পষ্ট জ্ঞানের মাধ্যমে। আল্লাহ মহান, পবিত্র; আমি কক্ষনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল হব না।

১০৮ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমার তরীকা এই যে, মানুষকে সম্পূর্ণ জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতে থাকব -আমি এবং আমার অনুসারীরাও। এটাই আমার পথ, পদ্ধতি ও নিয়ম যে আমি আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই একমাত্র তিনিই মা'বুদ, তাঁর কোন শরীক নেই, এ সাক্ষ্য দানের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাব। জেনে বুঝে, বিশ্বাস ও প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হয়ে এ পথে আহ্বান জানাবো। অনুরূপভাবে যারা আমার অনুসরণ করবে তারা সবাই এ পথের দাওয়াত দিবে। যে পথে তাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত দিয়েছেন। তারাও এটা করবে সম্পূর্ণরূপে জেনে-বুঝে, শরী'আত ও বিবেক অনুমোদিত পদ্ধতিতে। [ইবন কাসীর] উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোন চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। আমার উপর যারা ঈমান আনবে এবং আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে তারাও এ দাওয়াতের কাজ করবে। [বাগভী]

[২] 'যারা আমার অনুসরণ করেছে' এখানে তার অনুসরণকারী কারা তা নির্ধারণে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, এতে সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জ্ঞানের বাহক। আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ সাহাবায়ে কেরাম এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাদের অন্তর পবিত্র এবং জ্ঞান সুগভীর। তাদের মধ্যে লৌকিকতার নাম-গন্ধও নেই। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় রাসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্য মনোনীত করেছেন। তোমরা তাদের চরিত্র অভ্যাস ও তরীকা আয়ত্ত কর। কেননা, তারা সরল পথের পথিক। কলবী ও ইবনে যায়েদ বলেনঃ এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণের দাবী করে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তার দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানো এবং কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা। [বাগভী; কিওয়ামুস সুন্নাহ আল-ইস্ফাহানী, আল-হূজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহঃ ৪৯৮]

[৩] অর্থাৎ আল্লাহ্‌ শির্ক থেকে পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শির্ককেও যুক্ত করে দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শির্ক থেকে নিজের সম্পূর্ণ পবিত্রতার প্রকাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহ্‌র দাস এবং মানুষকেও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই।

সুরা: ইউসুফ

আয়াত নং :-১০৯

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِیْۤ اِلَیْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰىؕ اَفَلَمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَیَنْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْؕ وَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَیْرٌ لِّلَّذِیْنَ اتَّقَوْاؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমি যে নবীদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাঁরা সবাই মানুষই ছিল, এসব জনবসতিরই অধিবাসী ছিল এবং তাঁদের কাছেই আমি অহী পাঠাতে থেকেছি। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্বে যেসব জাতি চলে গেছে তাদের পরিণাম দেখেনি? নিশ্চিতভাবেই আখেরাতের আবাস তাদের জন্য আরো বেশী ভালো যারা (নবীর কথা মেনে নিয়ে) তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছে। এখনো কি তোমরা বুঝবে না?

তাফসীর :

[১] এ আয়াতেই (اَهْلِ الْقُرٰى) শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণতঃ শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকেই রাসূল প্রেরণ করেছেন; কোন গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরিত হননি। কারণ, সাধারণতঃ গ্রাম বা বনাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাব-প্রকৃতি ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাতপদ হয়ে থাকেন। [ইবন কাসীর] ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালামও শহরবাসী ছিলেন, কিন্তু কোন কারণে তারা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। তাই কুরআনের সূরা ইউসুফেরই ১০০ নং আয়াতে তাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতে কাফেরদের একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে, যেখানে তারা ফিরিশতার উপর এ কুরআন নাযিল হলো না কেন তা জিজ্ঞেস করেছিল। উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, আমি তো কেবল নগরবাসী পুরুষদেরকেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি। [কুরতুবী]

[২] এ আয়াতে নবীগণের সম্পর্কে (رِجَالًا) শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, নবী সবসময় পুরুষই হন। নারীদের মধ্যে কেউ নবী বা রাসূল হতে পারে না। মূলত: এটাই বিশুদ্ধ মত যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন নারীকে নবী কিংবা রাসূল হিসেবে পাঠাননি। কোন কোন আলেম কয়েকজন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার দাবী করেছেন; উদাহরণতঃ ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর বিবি সারা, মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর জননী এবং ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর জননী মরিয়ম। এ তিন জন মহিলা সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে ফিরিশতারা তাদের সাথে বাক্যালাপ করেছে, সুসংবাদ দিয়েছে কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোন বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু ব্যাপকসংখ্যক আলেমের মতে এসব আয়াত দ্বারা উপরোক্ত তিন জন মহিলার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্র কাছে তাদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বোঝা যায় মাত্র। এই ভাষা নবুওয়াত ও রেসালাত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। [ইবন কাসীর]

[৩] বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ক্ষণস্থায়ী। আসল চিন্তা আখেরাতের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থান চিরস্থায়ী এবং সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। আরো বলা হয়েছে যে, আখেরাতের সুখ-শান্তি

তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর্থ আল্লাহ্র নিষেধকৃত যাবতীয় বিষয় থেকে নিজেকে হেফাযত করে শরী'আতের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা।

এখানে একটি বিরাট বিষয়কে দু'তিনটি বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। একে যদি কোন বিস্তারিত বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় তাহলে এভাবে বলা যেতে পারেঃ "তারা যে তোমার কথার প্রতি দৃষ্টি দেয় না, তার কারণ হচ্ছে এই যে, কালকে যে ব্যক্তির জন্ম হলো তাদেরই শহরে এবং তাদেরই সামনে সে শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পৌঁছল, তার ব্যাপারে তারা কেমন করে একথা মেনে নেবে যে, একদিন হঠাৎ আল্লাহ তাকে নিজের দূত হিসেবে নিযুক্ত করেছেন? কিন্তু এটা কোন নতুন কথা নয়। দুনিয়ায় আজ প্রথমবার তাদেরকেই এর মুখোমুখি হতে হয়নি। এর আগেও আল্লাহ দুনিয়ায় নবী পাঠিয়েছেন। তাঁরা সবাই মানুষই ছিলেন। সেখানেও কখনো অকস্মাৎ কোন শহরে কোন অপরিচিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেনি এবং তিনি একথা বলেননি যে, তাঁকে নবী নিযুক্ত করে পাঠানো হয়েছে। বরং মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য যাদেরই আবির্ভাব হয়েছে তারা সবাই সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিজস্ব এলাকার ও জনবসতির লোকই ছিলেন। ঈসা, মূসা, ইবরাহীম, নূহ আলাইহিমুস সালাম কারা ছিলেন? যেসব জাতি তাঁদের সংস্কারের আহবান গ্রহণ করেনি এবং নিজদের ভিত্তিহীন কল্পনা বিলাসিতা ও নিয়ন্ত্রণহীন কামনা-বাসনার পিছনে দৌঁড়াতে থেকেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে তোমরা নিজেরাই দেখে নাও। তোমরা নিজেদের বাণিজ্যিক সফরসমূহে আদ, সামূদ, মাদয়ান ও লূত জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করছো। সেখানে কি তোমরা কোন শিক্ষা পাওনি? দুনিয়ায় তারা এই যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে এটিই তো এ খবর দিয়ে যাচ্ছে যে, আখেরাতে তাদের পরিণাম হবে এর চেয়ে আরো বেশী ভয়াবহ। আর যারা দুনিয়ায় নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে তারা কেবল দুনিয়ায়ই ভালো থাকেনি, আখেরাতেও তাদের পরিণতি এর চেয়ে আরো অনেক বেশী ভালো হবে।"

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

(হে নাবী! তোমার পূর্বেও এমন ঘটেছে যে,) শেষ পর্যন্ত রসূলগণ নিরাশ হয়েছে, আর লোকেরা মনে করেছে যে, তাদেরকে মিথ্যে কথা বলা হয়েছে, তখন তাদের (রাসূলদের) কাছে আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে, এভাবেই আমি যাকে ইচ্ছে রক্ষা করি। অপরাধী সম্প্রদায় থেকে আমার শাস্তি কক্ষনো ফিরিয়ে নেয়া হয় না।

১১০ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] এ নৈরাশ্য স্বীয় সম্প্রদায়ের ঈমান নিয়ে আসার ব্যাপারে ছিল।

[২] ক্বিরাআত হিসেবে এই আয়াতের কয়েকটা অর্থ করা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে উপযুক্ত অর্থ এই যে, ظَنُّوا এর কর্তা القوم অর্থাৎ কাফেরদেরকে করা হোক। অর্থাৎ কাফেররা প্রথমে তো শাস্তির ধমক পেয়ে ভয় করল; কিন্তু যখন বেশি দেরী হল তখন ধারণা করল যে, পয়গম্বরের দাবি অনুসারে আযাব তো আসছে না, আর না আসবে বলে মনে হচ্ছে, সেহেতু বলা যায় যে, নবীদের সাথেও মিথ্যা ওয়াদা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য নবী করীম (সাঃ)-কে সান্তনা প্রদান করা যে, তোমার সম্প্রদায়ের উপর আযাব আসতে দেরী হওয়ার কারণে ঘাবড়ানোর দরকার নেই, পূর্বের সম্প্রদায়সমূহের উপর আযাব আসতে অনেকানেক বিলম্ব হয়েছে এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও হিকমত অনুসারে তাদেরকে অনেক অবকাশ দেওয়া হয়েছে, এমনকি রসূলগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছেন এবং লোকেরা ধারণা করতে লেগেছে যে, তাদের সাথে আযাবের মিথ্যা ওয়াদা করা হয়েছে।

[৩] এতে বাস্তবে মহান আল্লাহর অবকাশ দানের সেই নীতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি অবাধ্যদেরকে দিয়ে থাকেন, এমনকি এ সম্পর্কে তিনি স্বীয় নবীদের ইচ্ছার বিপরীতও অধিকাধিক অবকাশ দেন, তাড়াহুড়া করেন না। ফলে অনেক সময়ে নবীদের অনুবর্তীরাও আযাব থেকে নিরাশ হয়ে বলতে শুরু করেন যে, তাদের সাথে এমনিই মিথ্যা ওয়াদা করা হয়েছে। স্মরণ থাকে যে, মনের মধ্যে শুধু এ ধরনের কুমন্ত্রণার উদ্রেক ঈমানের পরিপন্থী নয়।

[৪] এ উদ্ধারের অধিকারী শুধু ঈমানদাররাই ছিল।

لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِى الْأَلْبَٰبِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

এদের কাহিনীসমূহে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এ কুরআন কোন মিথ্যে রচনা নয়, বরং তাদের পূর্বে আগত কিতাবের প্রত্যয়নকারী আর যাবতীয় বিষয়ের বিস্তারিত বিররণে সমৃদ্ধ, আর মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য পথের দিশারী ও রহমাত।

১১১ নং আয়াতের তাফসীর:

অর্থাৎ নবীদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। এর অর্থ সমস্ত নবীর কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দাদের কি কি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয় এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে উচ্চতম শিখরে কিভাবে পৌঁছে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে।

অর্থাৎ এ কুরআন কোন মনগড়া কথা নয়। এর পূর্বে যা ছিল সেগুলোর মধ্যে যা যা সত্য সেগুলোকে এ কুরআন সমর্থন করে আর যেগুলো পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে সেগুলোকে অস্বীকার করে। [ইবন কাসীর] অথবা এ কাহিনী কোন মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা, তাওরাত ও ইঞ্জিলে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। [কুরতুবী]

ইউসুফ (عليه السلام) এর জীবনী বিস্তারিত তুলে ধরার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন বলে দাও পূর্বের নাবীরা যেমন সঠিক জ্ঞান ও তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তাঁর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন আমিও তাওহীদের পথ অবলম্বন করে তাঁর দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। তবে এ দাওয়াতী কাজ শুধু আমি একাই করি না, বরং আমি ও আমার অনুসারী যারা সবাই এ কাজ করে।

সুতরাং যারাই নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত বলে দাবি করবে তাদের উচিত ও আবশ্যক হল নিজে সৎ আমল করা এবং মানুষদেরকে আল্লাহ তা'আলার পথে ডাকা এবং তাঁর সাথে কাউকে

শরীক না করা। আর তাঁকে সর্বপ্রকার দোষ-ত্র"টি থেকে পবিত্র রাখা। এটাই ছিল সকল নাবীগণের কাজ। তাঁরা মানুষদেরকে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের দিকে আহ্বান করতেন।

উক্ত আয়াতে একজন দাঈ ইলাল্লাহ বা আল্লাহ তা'আলার পথে আহ্বানকারীর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে:

(১) (الدَّعْوَةُ إِلَي اللّٰهِ)

আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান; অর্থাৎ কোন দল, মত, পথ ও মাযহাব বা তরীকার প্রতি দাওয়াত নয়, বরং দাওয়াত হতে হবে সরাসরি আল্লাহ তা'আলার দিকে তথা আল্লাহ তা'আলার দীন ইসলামের প্রতি। আর দীন ইসলামের প্রতি দাওয়াতের প্রথম পদক্ষেপ হবে তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ব ও আকীদাহ বিশ্বাস এর প্রতি দাওয়াত। অতঃপর ইসলামের অন্যান্য ইবাদতের প্রতি। এটাই হল নাবী-রাসূলদের দাওয়াতী নীতি ও পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ পদ্ধতি তাঁর সাহাবী তথা উম্মাতকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামানে দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করেন তখন তাকে নির্দেশ দেন: "সর্বপ্রথম তুমি যে বিষয় দাওয়াত দেবে তাহল এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্বতার প্রতি যেন তোমার প্রথম দাওয়াত হয়। তারা যদি তোমার এ তাওহীদের দাওয়াত পূর্ণভাবে মেনে নেয় অতঃপর তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাত ও দিনে তোমাদের ওপর পাচঁ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন, এভাবে যাকাত ও অন্যান্য কথা বললেন। (সহীহুল বুখারী হা: ১৩৯৫, সহীহ মুসলিম হা: ১৯)

অতএব আলিমদের দাওয়াত হতে হবে সর্বপ্রথম তাওহীদ বা আকীদা বিশ্বাসের দিকে, কারণ আকীদাহ বিশ্বাসই হলো সবকিছুর মূল, আকীদাহ বাতিল হলে সবকিছু বাতিল হয়ে যায়।

(২) (عَلٰي بَصِيْرَةٍ)

"জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহকারে" অর্থাৎ যে বিষযের প্রতি দাওয়াত দেব সে বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে। না জেনে, না বুঝে প্রমাণহীন আমল-আখলাক ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি দাওয়াত দিলে হিদায়াতের পরিবর্তে গুমরাহির বেশি সম্ভাবনা থাকে।

(৩) (أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ)

“আমি এবং আমার অনুসারীরা” অতএব যে আলিম দাওয়াত দেবেন, তাকে সকল পীর মুরশিদ ও দল, তরীকার অনুসরণ বর্জন করে ব্যক্তি হিসেবে ও দাওয়াতের বিষয়ে একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারী হতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুকরণ ইবাদত কবূলের অন্যতম শর্ত, তা লঙ্ঘিত হলে এ দাওয়াত আল্লাহ তা‘আলার কাছে কবূল হতে পারে না। অতএব কোন মুজতাহিদ, মুফতী, পীর-মুর্শিদ ও বুজুর্গের অনুসরণ নয় বরং অনুসরণ হবে শুধু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের।

(৪) (وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ)

“আল্লাহ তা‘আলা পূত পবিত্র” দাওয়াতের প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহ তা‘আলাকে শির্কমুক্ত ও পূত পবিত্র রাখতে হবে এবং সে সঠিক বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিতে হবে।

(৫) (وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ)

“আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই” অতএব একজন আলিম বা দাঈকে আকীদাহ-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ও ইবাদত-বন্দেগী সকল ক্ষেত্রে শির্ক মুক্ত হতে হবে। আলিম সমাজের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো আল্লাহ তা‘আলার প্রতি আহ্বান করা। আর এক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়সমূহ অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে নচেৎ দাওয়াতে সার্থক ও সফল হওয়া সম্ভব হবে না।

(إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ إِلَيْهِمْ)

অর্থাৎ সকল নাবী-রাসূলই পুরুষ ছিলেন, কোন নাবী-রাসূল মহিলা ছিলেন না।

(حَتّٰي إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ)

অর্থাৎ যখন রাসূলগণ তাদের সম্প্রদায়ের লোকেদের থেকে ঈমানের আশা থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এরূপ বিশ্বাস তাদের চলে আসল তখন তাদের কাছে আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য এসেছিল। অতএব যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকেসহ আল্লাহ তা‘আলা রাসূলদেরকে কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর যারা অপরাধী, আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্য হয় তাদের থেকে তিনি শাস্তি প্রত্যাহার করেন না। বরং তিনি কিছু সময়ের অবকাশ দেন, যখন তিনি শাস্তি দেয়া উপযুক্ত মনে করেন তখন শাস্তি দেন।

(مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰي)

ইউসুফ (عليه السلام) এর জীবন কাহিনী শুনে অনেকে মনে করতে পারে যে, এটা একটা মিথ্যা ঘটনা যা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রচনা করেছেন। না, এটা কোন মিথ্যা ঘটনা নয় এবং বাণীও নয়, বরং এ কিতাব পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং সকল কিছুর বিশদ বর্ণনাকারী। যারা এ কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে তাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা এবং যারা ঈমান আনবে তাদেরকে এ কিতাব সঠিক পথ দেখাবে ও তাদের প্রতি করুনা হয়ে থাকবে।

সুতরাং আমরা যদি দৃঢ় ঈমানের সাথে কুরআনের মর্মার্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি তাহলে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারব এবং তা আমাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেবে ও রহমত হয়ে থাকবে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-সহ সকল নাবীর দাওয়াতী মূলনীতি ছিল একটাই যে, আল্লাহ তা‘আলার তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রতি আহ্বান ও শির্ক হতে বিরত রাখা।

২. পুরুষের ওপর মহিলার নেতৃত্ব দেয়া ঠিক নয়। কারণ তা অশান্তি ও ব্যর্থতার কারণ। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা কোন মহিলাকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দেননি।

৩. দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য, আখিরাতই স্থায়ী এবং মু’মিনের জন্য চির সুখের স্থান। সুতরাং আখিরাতকেই সর্বাবস্থায় প্রাধান্য দেয়া উচিত।